প্রযুক্তিতে অগ্রযাত্রা: ডিজিটাল থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ

হীরেন পণ্ডিত

শেখ হাসিনার প্রথম স্বপ্ন ছিলো ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বে এক অনন্য উচ্চতায় অবস্থান করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যদি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ না করতেন তবে করোনা মহমারির বিপর্যয়ের সময় বাংলাদেশের আরও বহু মানুষ মৃত্যুবরণ করত এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও আরও শোচনীয় হতে পারতো। তার সুদক্ষ নেতৃত্বের কারণেই এই সময় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অনেক উন্নত দেশের মতো খারাপ অবস্থায় পতিত হয়নি। অথচ আমরা দেখেছি বিশ্বের অনেক ধনী দেশেও অর্থনৈতিক অবস্থা খুব নাজুক হয়ে পড়েছিল। আবার রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবেও বাংলাদেশ খুব সাহসের সঙ্গেই অর্থনৈতিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাই তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্বের জন্য বিশ্বের অনেক দেশের কাছেই অনুসরণীয় নেত্রী।

২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর শেখ হাসিনা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ঘোষণা করেন। তার আগে বিশ্বের কোনো দেশ পুরো দেশটাকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে বদলে দেয়ার কথা চিন্তায় আনেনি। বাংলাদেশের পর ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরে ব্রিটেন এবং ২০১৪ সালের ১৫ আগস্ট ভারত আমাদের পথ অনুসরণ করে। আবার ২০১১ সালে জার্মানি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা ভাবে এবং ২০১৬ সালে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ঘোষণা দেয়। অবশ্য জাপান কোরিয়া বহুদিন থেকেই ইউবিকুটাস দেশ হিসেবে তাদের গড়ে তোলার কথা বলে আসছিল এবং শ্রীলঙ্কা ও রুয়ান্ডা ই-লঙ্কা ই-রুয়ান্ডা স্লোগান দিয়ে আসছিল; কিন্তু ডিজিটাল যুগের প্রকৃত আপ্ত বাক্যটি তারা কেউ উচ্চারণ করেনি। অথচ শেখ হাসিনা রূপকল্প-২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ, এসডিজি-২০৩০, স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১, ২১০০ সালের বাংলাদেশ ডেলটা প্ল্যান বাস্তবায়নের কথা ঘোষণা করেছেন।

বাংলাদেশে ডিজিটাল কানেক্টিভিটির জন্য যেসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয় সেগুলোর মধ্যে আইসিটি ডিভিশনের বাংলা গভনেট প্রকল্প, ইনফো সরকার-২ প্রকল্প, ইনফো সরকার-৩ প্রকল্প উল্লেখযোগ্য। প্রথম প্রকল্পটির মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সেগুলোর আওতাধীন দুইশতাধিক সরকারি অধিদপ্তর ও সংস্থা এবং ৬৪ জেলা ও ৬৪ সদর উপজেলা কানেক্ট করা হয়। দ্বিতীয় প্রকল্পের মাধ্যমে সব জেলা ও উপজেলার সব সরকারি অফিস, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, পিটিআইগুলো কানেক্ট করা হয়। এতে ১৮,৪০০ সরকারি অফিস কানেক্ট করে রাজধানীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করার পদ্ধতি চালু করা হয়। এ ছাড়া ২৫,০০০ সরকারি কর্মকর্তার কাছে ট্যাবলেট পিসি দেয়া হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল সরকারি অফিসের কাজগুলো ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা। আর তৃতীয় প্রকল্প দিয়ে দেশের ২৬০০ ইউনিয়নকে কানেক্ট করা হয়। এর বাইরে আরও প্রায় ১২০০ ইউনিয়নের কানেক্টিভিটি স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করেছে বিটিসিএল। এ ছাড়া এখন আরও ৬১৭টি ইউনিয়নকে কানেক্ট করার জন্য বিটিআরসির এসওএফ তহবিল দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

পাশাপাশি এটুআই সরকারি অফিসে ই-নথি চালু করার জন্য এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য

প্রশংসনীয় অবদান রেখেছে। উল্লেখ্য, এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নে সামগ্রিক পরিকল্পনা ও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য পুত্র আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়।
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনে দেশের দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল লাইনের সংযোগ স্থাপন, ৮৫০০ ডাকঘরকে ই-পোস্ট অফিসে রূপান্তরকরণ, পোস্টাল ক্যাশকার্ড সার্ভিস প্রবর্তন, ফোর জি চালুকরণ, মোবাইল সিম রেজিস্ট্রেনের সিবিভিপিএন চালুকরণ, মোবাইল ফাইনান্সিং সার্ভিসের জন্য 'নগদ' চালুকরণ এবং সর্বোপরি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ ইত্যাদি যুগান্তকারী ডিজিটাইজেশন দেশে বিস্তার লাভ করেছে।

দেশে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের কাজে ভূমিকা রাখার জন্য বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি) গঠন করা হয়েছিল ২০০২ সালে। বিটিআরসি মূলত ডিজিটাল সেবা প্রদানের জন্য মহাসড়ক অর্থাৎ অবকাঠামো তৈরি ও নিয়ন্ত্রণ কাজ করে থাকে। এ জন্য বিটিআরসির অধীনে প্রায় ৩৮০০ লাইসেন্স গ্রহীতা আছে।
এর মধ্যে মোবাইল অপারেটর, এনটিটিএন অপারেটর, আইজিডব্লিউও, আইআইজি, আইএসপি, আইপিটিএসপি এবং অন্য অপারেটররা রয়েছে। তবে শুধু ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার রয়েছে ২৯০০-এর অধিক।

আর এখন চলমান আছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ নির্মাণের কাজ এবং দেশের তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল লাইন সংযোগের কাজ চলমান রয়েছে।
'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এখন আর কোনো স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা।
ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয় সেই ২০০৯ সালে। এই ডিজিটাল বাংলাদেশ অভিযাত্রায় মূল দায়িত্ব পালন করেছে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের এটুআই প্রকল্প।

স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ প্রসঙ্গ

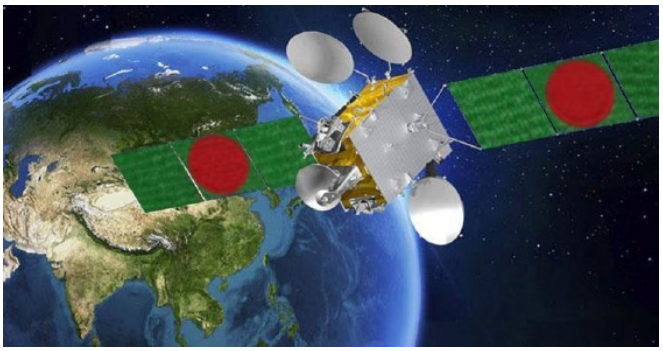

বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মাইলফলক ২০১৮ সালে বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট আকাশে পাঠানো। স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের কাজটি মূলত ডিজিটাল বাংলাদেশ অভিযাত্রারই অংশ ছিল বলা যায়।

বাংলাদেশে প্রযুক্তি চালু করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় ছিলেন প্রধান আর্কিটেক্ট। তিনি সব সময় এসব বিষয়ে কারিগরি দিকনির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং বলা যায় ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা হলেন শেখ হাসিনা আর সেটা বাস্তবায়নের আর্কিটেক্ট হলেন তারই সুযোগ্য পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়। মূলত তিনিই ছিলেন শুরু থেকে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির এই অগ্রগতির নেপথ্য নায়ক; কিন্তু এখানে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতার কথা না বললে ইতিহাস অসম্পন্ন থাকবে। ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাঙামাটির বেতবুনিয়াতে উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র উদ্বোধন করেছিলেন। সেই ভূ-কেন্দ্র আমরা এখন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর ল্যান্ডিং স্টেশন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু সেই সময়েই স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের চিন্তা করে ওই উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় বঙ্গবন্ধু কতটুকু বিজ্ঞান মনস্ক ও দূরদর্শী নেতা ছিলেন। অথচ দুর্ভাগ্য আমাদের বেতবুনিয়াতে ওই ভূ-কেন্দ্র উদ্বোধনের মাত্র দুই মাসের মাথায় তাকে জীবন দিতে হয়েছে।

স্যাটেলাইট নির্মাণ প্রকল্পটি ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতাধীন ছিল। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনের (বিটিআরসি) ওপর। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণ বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করে। ২০০৯ সালে জাতীয় তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালায় রাষ্ট্রীয় কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের বিষয়টি যুক্ত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে বাংলাদেশের নিজস্ব কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের জন্য আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিটের (আইটিইউ) কাছে আবেদন করে বাংলাদেশ। কৃত্রিম উপগ্রহের নকশা তৈরির জন্য ২০১২ সালের মার্চে প্রকল্পের মূল পরামর্শক হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'স্পেস পার্টনারশিপ ইন্টারন্যাশনাল'কে নিয়োগ দেয়া হয়।

কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে বাংলাদেশে সম্প্রচার ও টেলিযোগাযোগ সেবা পরিচালনার জন্য ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে একনেক সভায় দুই হাজার ৯৬৮ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে বরাদ্দ দেয়া হয় এক হাজার ৩১৫ কোটি ৫১ লাখ টাকা, যা মোট ব্যয়ের প্রায় ৪৪ শতাংশ। এ ছাড়া 'বিডার্স ফাইন্যান্সিং' এর মাধ্যমে এ প্রকল্পের জন্য এক হাজার ৬৫২ কোটি ৪৪ লাখ টাকা সংগ্রহের পরিকল্পনা নেয়া হয়।
মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্যাটেলাইট সিস্টেম কিনতে ফ্রান্সের কোম্পানি থ্যালাস অ্যালেনিয়া স্পেসের সঙ্গে এক হাজার ৯৫১ কোটি ৭৫ লাখ ৩৪ হাজার টাকার চুক্তি করে বিটিআরসি। অন্যদিকে ২০১৫ সালের বিটিআরসি রাশিয়ার উপগ্রহ কোম্পানি ইন্টারস্পুটনিকের কাছ থেকে কক্ষপথ কেনার আনুষ্ঠানিক চুক্তি করা হয়। এর অর্থমূল্য ছিল ২১৮ কোটি ৯৬ লাখ টাকা।

২০১৭ সালে 'বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড' নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়। কৃত্রিম উপগ্রহের সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য। এই কোম্পানি সংস্থাটি আরও আগেই গঠন করার কথা ছিল। শেষ পর্যন্ত খুব দ্রুততার সঙ্গেই এটি গঠন করা হয়।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা এবং স্মার্ট বাংলাদেশ

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও বিটিআরসি ২০১৮ সালে আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের নির্দেশে বাংলাদেশে প্রথম ৫জি প্রযুক্তির

টেস্ট করেছে এবং ২০২১ সালে পরীক্ষামূলকভাবে ৫জি চালু করেছে। তবে ৫জি প্রযুক্তি বিকাশের জন্য এর সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় জরুরি বিবেচনায় নিতে হবে। ৫জি প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত প্রযুক্তিগুলোর সঙ্গে আমাদের খুব একটা পরিচয় নেই। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিঙ, বিগ ডাটা, ব্লক চেইন, আইওটিসহ ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির কোনোটাতেই আমরা তেমন এগিয়ে নেই। ৫জি শুধু কথা বলার বা ফেসবুক চালানোর প্রযুক্তি নয়। এটি মূলত শিল্প বিপ্লবের হাতিয়ার। তাই এটি শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষি স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে অটোমেশনের কাজে ব্যবহার করতে হবে। এগুলোর জন্য সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ অতি প্রয়োজন। আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১ অর্থাৎ মধ্যম আয়ের দেশ তথা উন্নয়নশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণ করে এখন আমরা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আরও এগিয়ে যাচ্ছি, উন্নত বাংলাদেশের দিকে তথা স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে। এর মধ্যবর্তী সময়কালে আবার জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি অর্জনের কাজও সম্পন্ন হবে।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম স্বীকার করছে যে, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এতটাই যান্ত্রিক যে মানুষের জন্য সেটি বিপজ্জনক হতে পারে। মানুষের কর্মচ্যুতির পাশাপাশি প্রযুক্তির দাপট এমনভাবে সম্প্রসারিত হয়ে পারে যে, মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রায় মানুষ একটু থমকে দাঁড়াতেই পারে। তবে ওই ফোরাম পঞ্চম শিল্প বিপ্লবকে মানবিক বলেছে। কারণ পঞ্চম শিল্প বিপ্লব প্রযুক্তিকে মানুষের স্থলাভিষিক্ত না করে মানুষের জন্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করবে। জাপান ফেডারেশন অব বিজনেস এর রূপরেখা অনুসারে সোসাইটি ৫.০ এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে- অর্থনীতি থেকে শুরু করে জাপান সমাজের সব স্তরকে ডিজিটাল করার মাধ্যমে পুরো সমাজকে রূপান্তর করা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা ভাবলে লক্ষ্য করা যায়, আমাদের লক্ষ্যও তাদেও চেয়ে অনেক বেশি সম্প্রসারিত। তবে সেখানে কিছু পার্থক্যতো থাকবেই। জাপানের পঞ্চম সোসাইটির প্রেক্ষাপটে কেইদারেনের রূপরেখায় ৫টি পর্যায়ের সোসাইটির কথা বলা হয়েছে: শিকারি সমাজ, কৃষি সমাজ, শিল্প সমাজ, তথ্য সমাজ এবং সুপার স্মার্ট সমাজ বা সোসাইটি ৫.০।

জাপান চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে অংশ নিতে শুরু করায় তার সমাজ ও উৎপাদন ব্যবস্থায় কৃত্রিম বুদ্ধি, রোবোটিঙ, আইওটি, বিগ ডাটা ইত্যাদি প্রযুক্তি দেশটির রূপান্তরে একটি নতুন ভূমিকা পালন করছে এবং শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনছে। কাজেই স্মার্ট বাংলাদেশ কৌশল ও কর্মসূচি প্রণয়নে আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, পঞ্চম শিল্প বিপ্লব ও সোসাইটি ৫.০ এর সামগ্রিক বিষয়াদির পাশাপাশি এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার কথাও মনে রাখতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে ২০৪১ সালে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তার সেই ঘোষণার সঙ্গে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি বা আমাদের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি থেকে সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠার কর্মসূচিটি গ্রহণের একটি সর্বজনীন দিক লক্ষ্যণীয়। তা হলো দেশের সব মানুষকে সম্পৃক্ত করে সরকার শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি ও জীবনধারার সম্মিলিত রূপান্তর করে এই সমাজ গড়তে হবে, যার লক্ষ্য ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল সমাজ।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন সফলভাবে বাস্তবায়নের পর আমরা এখন সেই নতুন কর্মসূচি নিয়ে সামনের দিকে যাচ্ছি। এই কর্মসূচির নাম 'স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১'। এটি শেখ হাসিনার দ্বিতীয় স্বপ্ন-বাংলাদেশকে উন্নত বাংলাদেশ বানানোর জন্য। এ কর্মসূচির চারটি স্তম্ভ স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট সোসাইটি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট, স্মার্ট ইকোনোমি। সুতরাং ২০৪১ সালে বাংলাদেশ হবে একটি সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিদীপ্ত, জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনী স্মার্ট বাংলাদেশ। তবে এখন আমাদের কাঙ্ক্ষিত সৃজনশীল জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল অর্থনীতির প্রাথমিক বিকাশ ঘটাতে কাজ করতে হবে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে ডিজিটার যুগের উপযোগী মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রম-পাঠদানসহ পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে ডিজিটাল যুগের উপযোগী করতে হবে। কারণ স্মার্ট সিটিজেন তৈরি করতে হবে আগে। ডিজিটাল দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ তৈরি করে বিদেশে পাঠাতে পারলে প্রচুর ফরেন কারেন্সিও পাওয়া যাবে।

স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট ইকোনোমি

স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট ইকোনোমিতে রূপান্তরের জন্য আমাদের সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে নীতি নির্ধারণে ও পরিকল্পনায় যেতে কিছু বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। যেমন সব ক্ষেত্রে ক্যাশলেস লেনদেনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ, সব খাতের ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ, উৎপাদনের সব স্তরে ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রয়োগ অর্থাৎ অটোমেশন করা, সর্বত্র ডিজিটাল প্রশিক্ষণ চালুকরণ, সৃজনশীল ও উদ্ভাবন পদ্ধতির জন্য কাজ করা, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, প্রশাসন খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে ডিজিটাল করা, আইন-আদালত, সালিশ, সরকারি সেবা, হাটবাজার, জলমহাল, ভূমি ব্যবস্থাপনাসহ সব কর্মকাণ্ড ডিজিটাল করা, মেধাশিল্প, সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন ও সেবা খাতকে প্রাধান্য দিয়ে শিল্প নীতি তৈরি করা, দেশের সব আইনকে জ্ঞানভিত্তিক সমাজের উপযোগী করা, সর্বোপরি ডিজিটাল নিরাপত্তাকে সর্বোত্তম গুরুত্ব দিয়ে তার নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

২০৪১ সালে স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য হলো: জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল সাম্যসমাজ গঠনের মাধ্যমে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা। আর তার কর্মসূচির আওতায় রাখতে হবে পেপারলেস সভ্যতা, ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল সভ্যতা, ডিজিটাল নিরাপত্তা ও ডিজিটাল যুদ্ধ, ডিজিটাল সংযুক্তি, মাতৃভাষার বিশ্ব এবং সাম্য সমাজ। ইতোমধ্যেই আমাদের কৃষি, ভূমি, স্বাস্থ্য খাতে কিছু ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করা হয়েছে। তবে এখন দরকার দক্ষতা ও গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য মনোযোগ দেয়া। সম্ভাব্য সব ক্ষেত্রে অটোমেশন করতে হবে। বিদ্যমান সব ডিজিটাল নীতিমালা ও গাইডলাইনগুলো যুগোপযোগী করে তৈরি করতে হবে, যাতে ৫জি প্রযুক্তি প্রয়োগের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী চিন্তার ফলাফল হলো আমাদের

ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ প্রাপ্তি। তিনি বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে বাংলাদেশের মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছেন। যেমন করে তিনি অসাধ্য সাধন করেছেন পদ্মা সেতু নির্মাণ করেও। কাজেই এমন একজন দেশপ্রেমিক মানুষ ও 'মানবতার জননী' খ্যাত প্রধানমন্ত্রী এখন বিশ্বের অনেক নেতার কাছেই অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রশ্ন আসতে পারে, স্মার্ট বাংলাদেশের পর কি বাংলাদেশ থেমে থাকবে? না, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তারপরের কর্মসূচিও তৈরি করে দিয়েছেন। তা হলো ২১০০ সালের বাংলাদেশের জন্য ডেল্টাপ্ল্যান। সুতরাং শেখ হাসিনার মতো এমন একজন দূরদর্শী প্রধানমন্ত্রী পেয়ে বাংলাদেশ গর্বিত ও ধন্য। আমরা বাঙালিরা তাঁকে নিয়ে অহঙ্কার করতেই পারি।

প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

ডিজিটাল প্রযুক্তি, ডাটা অ্যানালিটিক্স, অটোমেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল প্রযুক্তির সমন্বয়ের কারণে ব্যবসা ও সমাজের ক্রমাগত পরিবর্তনকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বলা হয়। দক্ষতা বৃদ্ধি, নতুন ব্যবসায় মডেল এবং উদ্ভাবনের গতি বাড়ানোর মাধ্যমে ফোরআইআর শিল্প, অর্থনীতি ও সমাজকে পরিবর্তন করছে। এটি জটিল সমস্যার সমাধান, উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ক্ষমতা রাখে। টেকনোলজি অ্যান্ড ইনোভেশন রিপোর্ট ২০২৩ অনুযায়ী এখন সময় এসেছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এই সবুজ প্রযুক্তি বিপ্লবে আরও বেশি অংশ ক্যাপচার করা এবং তা ব্যবহার করে তাদের অর্থনীতির উন্নয়ন করা ও বৈষম্য কমানোর।

গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ একটি স্মার্ট জাতি গঠনে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে। এ রূপান্তরটি চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, যা অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের একটি নতুন ঢেউ সৃষ্টি করেছে। এই প্রযুক্তিগত উন্নয়নগুলো সম্মিলিতভাবে একটি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অবদান রাখছে। গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্স ২০২২ অনুযায়ী বাংলাদেশ জিআইআই ২০২২-এ বৈশিষ্ট্যযুক্ত ১৩২টি দেশের মধ্যে ১০২তম স্থানে রয়েছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) দ্বারা গ্লোবাল ইনডেক্স অব ডিজিটাল এন্টারপ্রেনিউয়ারশিপ সিস্টেমসে ১১৩টি অর্থনীতির মধ্যে বাংলাদেশ ৯৬তম স্থান অর্জন করেছে।

বাংলাদেশে প্রায় ২০০টি ফোরআইআর কোম্পানি কাজ করছে এবং এর ৫০টিরও বেশি আন্তর্জাতিকভাবে নিজেদের সুনাম বজায় রেখেছে। বলা যায় ব্রেইনস্টেশনের এআইভিত্তিক বিশ্লেষণ সফটওয়্যারের অনেক চাহিদা রয়েছে এবং সর্বশেষ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া ও জাপানসহ অন্য দেশগুলোয় রপ্তানি ১০ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। কৃষিক্ষেত্রটি এমন একটি প্রাথমিক ক্ষেত্র– যেখানে এই পরিবর্তন স্পষ্টভাবে দেখা যায়। বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক ও প্রযুক্তি কৃষি খাতের আধুনিকায়ন নিবিড়ভাবে সহায়তা করছে। বর্তমানে কৃষকদের স্মার্টফোন অ্যাপিকেশন এবং ইন্টারনেট প্ল্যাটফরমগুলোয় অ্যাকসেস রয়েছে– যা আবহাওয়ার পূর্বাভাস, ফসলের ব্যবস্থাপনা ও বাস্তব সময়ের বাজারমূল্য সরবরাহ করে। কৃষি পর্যবেক্ষণ এবং নির্ভুল কৃষি পরিচালনার জন্য ড্রোন ও স্যাটেলাইট প্রযুক্তির ব্যবহারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে টেকসই ও উচ্চতর ফলন অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে। আই পেজ বাংলাদেশ লিমিটেড ও উৎসব টেকনোলোজি লিমিটেডের মতো কোম্পানিগুলো এই পরিবর্তনের অগ্রভাগে রয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে কৃষি পর্যবেক্ষণ, স্মার্ট সেচ, রোবটিক কৃষি সরঞ্জাম, কৃষক মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এবং ক্লাউডভিত্তিক ফার্ম ম্যানেজমেন্টের জন্য আইওটি মাটি সেন্সর, এআই আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ, ড্রোন ও প্ল্যাটফরম ব্যবহার করছে।

ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষা খাতে বাংলাদেশের অগ্রগতিও উল্লেখযোগ্য; বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারীর সময় যখন দূরবর্তী শিক্ষার প্রয়োজন হয়েছিল– তখন থেকে অনলাইন লার্নিং পোর্টাল, ডিজিটাল পাঠ্যপুস্তক এবং ই-লার্নিং উপকরণগুলোর জনপ্রিয়তা বেড়েছে। এটি দক্ষতা বৃদ্ধি ও শিক্ষার নতুন সুযোগ তৈরি করেছে। টিম ক্রিয়েটিভ, উৎসব টেকনোলজি লিমিটেড, ইশিখন ডটকম, আইজুম লিমিটেড, ক্রিয়েটিভ আইটি লিমিটেডের মতো একাডেমিক প্রতিষ্ঠানগুলো ই-লার্নিং সরঞ্জাম ও প্ল্যাটফরম সরবরাহ করে। প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাসঙ্গিক শিক্ষাসামগ্রী তৈরি এবং অনলাইনে শিক্ষা দ্বারা দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। প্রযুক্তির

উন্নতি চিকিৎসাশিল্পের জন্যও আশীর্বাদস্বরূপ। টেলিমেডিসিনসেবা গ্রামীণ ও দূরবর্তী স্থানে চিকিৎসার সুযোগ বাড়িয়ে দিয়েছে। এ ছাড়া এআই দ্বারা চালিত স্বাস্থ্য অ্যাপ্লিকেশন ও চ্যাটবট প্রযুক্তির সঙ্গে লোকজনকে তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করতে সাহায্য করছে। প্রযুক্তি ও স্বাস্থ্য একসঙ্গে কাজ করার জন্য এখন চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রযুক্তির অগ্রগতি অত্যন্ড় গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান প্রযুক্তি চিকিৎসকদের দূরবর্তী স্থানে চিকিৎসা দিতে সাহায্য করছে। স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং এআই তৈরি প্রযুক্তির উন্নতি বাংলাদেশের ভবিষ্যত স্বাস্থ্য খাতের জন্য অত্যন্ত আশীর্বাদ হতে পারে।

ই-গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নয়ন করছে। সরকারি পরিসেবাগুলোয় অনলাইন প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পাচ্ছে– যা প্রশাসনিক লাল ফিতার দৌরাত্ম্য ও দুর্নীতিকে কমিয়েছে। ন্যাশনাল আইডি কার্ড ও বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন হলো ডিজিটাল শনাক্তকরণ প্রযুক্তির দু'টি উদাহরণ– যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিরাপত্তার উন্নয়ন করেছে। আইডেন্টিটি ম্যানেজমেন্ট, অটোমেশন এবং সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশনের মতো পাবলিক সার্ভিসে নিরাপত্তা ও দক্ষতা বাড়াতে বেসিস থেকে অটোনমি টেক

বাংলাদেশ লিমিটেড এবং লিডস করপোরেশন লিমিটেড সক্রিয়ভাবে ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদ ও দক্ষ জনসেবা দিতে সহায়তা করছে।

তাছাড়া বাংলাদেশে ই-কমার্সশিল্পের বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে হয়েছে। অনলাইন মার্কেটপ্লেস, পেমেন্ট গেটওয়ে ও হোম ডেলিভারি পরিসেবাগুলো ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয় হয়ে উঠছে– যা ব্যবসার জন্য গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানো এবং ভোক্তাদের পণ্য ও পরিষেবাগুলো অ্যাকসেস করা সহজ করে তুলেছে।

এসব উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। ২০০৮ সালে চালু হওয়া 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' রূপকল্প এই প্রযুক্তিগত অনেক অগ্রগতির ভিত্তি স্থাপন করেছে। তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো, ডিজিটাল সাক্ষরতা প্রোগ্রাম ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিনিয়োগ একটি স্মার্ট ভবিষ্যতের দিকে দেশের অগ্রগতিকে চালিত করছে। একটি স্মার্ট জাতি হওয়ার পথে বাংলাদেশের অগ্রগতি ইতিবাচকভাবে চলছে। এখন প্রত্যেকের প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত ও সাইবার নিরাপত্তা সমস্যাগুলো মোকাবিলা করতে প্রযুক্তির উন্নয়ন তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সচেষ্টভাবে কাজ করে যাচ্ছে। রোবটিঙ, ইন্টারনেট অব থিংস, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ব্লকচেইন, মাইক্রোপ্রসেসর ডিজাইন ক্যাপাসিটি প্রমোট ইত্যাদিসহ বাংলাদেশ বেশ কিছু ক্ষেত্রে দ্রুতত এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে ফোরআইআর এগিয়ে চলেছে। সরকার দেশের অবকাঠামো নির্মাণ এবং আরও যোগ্য মানবসম্পদ তৈরি করছে। বেশ কিছু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানও ফোরআইআর প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করছে। ফলস্বরূপ– এটি অনুমান করা হচ্ছে যে, পরবর্তী বছরগুলোয় বিশেষ করে আগামীর বাংলাদেশে ফোরআইআর ফার্মের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। প্রযুক্তিগত অগ্রগতির জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সম্ভাবনাকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী নেতৃত্বস্থানে অবস্থান করবে।

বাংলাদেশেও তথ্য সুরক্ষার উপায় হতে পারে ক্লাউড কম্পিউটিং

১৯৬০ থেকে ১৯৮০র দশকে কম্পিউটারে তথ্য সংরক্ষণের বিপ্লবের মাঝে গ্লোবাল নেটওয়ার্কিংয়ের ব্যাপক উন্নতি ঘটে এবং ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে সকল কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার থাকে সার্ভিস দাতার তত্ত্বাবধানে। ক্রেতা বা ব্যবহারকারী শুধু ছোট ও কম খরচের একটি ডিভাইসের মাধ্যমে ইন্টারনেটের সহযোগিতায় ভার্চুয়ালি সার্ভিসদাতার মূল কম্পিউটার বা সার্ভারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে প্রয়োজনীয় কম্পিউটিং কাজ সম্পাদন করে থাকে। কাজ শেষে সকল তথ্য আবার ওই সার্ভারে জমা রাখতে পারে মূল কম্পিউটার বা সার্ভারে। যেহেতু ক্রেতা বা ব্যবহারকারী থেকে অনেক দূরে থাকে, ফলে সার্ভিসদাতার অবকাঠামো, রিসোর্সসমূহ এবং সব প্রক্রিয়া ক্রেতা বা ব্যবহারকারীর কাছে অনেকটা অদৃশ্যমান মনে হয়। ফলে ক্রেতা বা ব্যবহারকারীর কাছে এসব সার্ভিস অনেকটা মেঘ কিংবা কল্পনার কোনো রাজ্য থেকে পাওয়ার মতো মনে হয়। নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম আঁকার সময়ে ক্রেতা ও সার্ভারের মাঝের ইন্টারনেটের অংশটিকে অনেক আগে থেকেই মেঘের ছবি দিয়ে বোঝানো হতো। আবার সিস্টেম ডায়াগ্রামে জটিল সাংগঠনিক কোনো বিষয় সম্পর্কে ধারণার জন্য ক্লাউড বা মেঘের মতো প্রতীক ব্যবহার করা হয়। সে থেকেই অদৃশ্য বা ভাসমান এই প্রযুক্তিটির নামকরণ হয়েছে ক্লাউড কম্পিউটিং। বোঝা যাচ্ছে, এটি কোনো নির্দিষ্ট একক টেকনোলজি নয়, অনেক টেকনোলজিকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করা একটা ব্যবসায়িক মডেল বা বিশেষ পরিষেবা। এই মডেলে ব্যবহারকারী বা ক্রেতার চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে বেশ কিছু চলমান প্রযুক্তির সমন্বয়ে বিভিন্ন রিসোর্স এবং সার্ভিস বিশেষভাবে বাজারজাত করা হয় বা ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের এই উন্নত পরিষেবা কিছু কম্পিউটারের গ্রিড সিস্টেমের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেকনোলজি দ্বারা সংজ্ঞায়িত ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের নিম্নলিখিত ৪টি প্রধান পরিষেবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এগুলো হলো- এক. ব্রড এক্সেস নেটওয়ার্ক যে কোনো জায়গা থেকে অনায়াসে সার্ভিস পাওয়া যাবে। দুই. অন ডিমান্ড সেলফ সার্ভিস- যখন দরকার কাস্টমার মুহূর্তের মধ্যেই প্রয়োজনীয় রিসোর্স যোগ করে নিতে পারবে। ৩. রিসোর্স পুলিং- যখন দরকার তখন রিসোর্স নেওয়া আবার ছেড়ে দেওয়া যাবে, যেটা অনেক সাশ্রয়ী। ৪. মিটারড সার্ভিস- ঠিক যতটুক ব্যবহার ততটুকুরই বিল দেওয়া যাবে।

এই পরিষেবাগুলো নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং গ্রাহকদের ডেটা সর্বদা নিরাপদ এবং সুরক্ষিত রাখার জন্য ক্লাউড প্রোভাইডাররা সার্ভারগুলোকে সর্বক্ষণিক নজরদারিতে রাখে এবং নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করে থাকে- ডেটা এনক্রিপশন করা, একাধিক স্তরের নিরাপত্তা দেওয়া এবং উচ্চ প্রাপ্যতা ও স্থায়িত্বের জন্য একাধিক সার্ভারে কপি করা, ত্রুটি ও সহনশীলতার জন্য বিভিন্ন ডেটা সেন্টারে ভার্চুয়ালাইজেশন স্তর এবং সফটওয়্যার চালানো, লোড বা ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়লে অটো-স্কেলিং

আউট এবং লোড কমে গেলে অটো-স্কেলিং ডাউন করা, যখন একটি সার্ভারে সমস্যা হয়, তখন অন্য এক-টিতে স্থানান্তরিত করা, শুধু যে পরিমাণ সেবা ও রিসে-র্স ব্যবহার করা হবে সে পরিমাণ বিল গণনা করা, ৬. প্রকৃত ডেটা সেন্টার পরিচালনা এবং সুরক্ষিত করা ইত্যাদি। বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির এই সহজ ও নিরাপদ মাধ্যম ব্যবহার করে গড়ে উঠেছে শত শত আইটি ফার্ম। ছোট্ট একটি শপ থেকে শুরু করে বহুজাতিক কোম্পানি, প্রায় সবখানেই এখন তথ্য সংরক্ষণ করা হয় ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের সাহায্যে। মূলত প্রযুক্তিবিদরা বহু আগে থেকেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন কি ভাবে সমস্ত তথ্যকে এক করে তা মানুষের সেবায় পৌঁছানো যায়। এরই ধারাবাহিতায় ক্লাউড কম্পিউটিং এখন প্রযুক্তি দুনিয়ায় বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। তবে প্রযুক্তির বাজারে সত্যিকারের ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের আবির্ভাব ঘটেছে অ্যামাজনের হাত ধরে। পরবর্তীতে ২০১০ সালে মাইক্রোসফট ধরনের পরিষেবা এবং আরও পরে গুগল তাদের গুগল কম্পিউটার ইঞ্জিন প্রযুক্তি বাজারে নিয়ে আসে। এই সময়ে আরও কিছু প্রতিষ্ঠান খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভার্চুয়াল মেশিনের মাধ্যমে ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের সেবা নিয়ে হাজির হয়েছিল। যদিও বর্তমান সময়ে অ্যামাজন, গুগল ও মাইক্রোস-ফটই প্রতিযোগিতায় টিকে রয়েছে। কারণ, মানুষের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো সেবার মান বাড়াতে পারেনি।

অন্যদিকে, উল্লিখিত তিনটি প্রতিষ্ঠান সেবার মান বাড়িয়ে একে অপরকে ছাড়িয়ে যেতে প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা করে যাচ্ছে। ওরাকল, আইবিএম এবং আলিবাবা এই প্রতিযোগিতায় কয়েক বছর ভালো অবস্থানে থাকলেও এখন তারা ব্যবসা প্রায় গুটিয়ে নিয়েছে। ভার্চুয়াল যন্ত্রগুলো ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের মূল উপাদান হিসেবে দিনে দিনে আরও গ্রাহকসুবিধা বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। এই সুবিধাসমূহের মধ্যে রয়েছে নেটওয়ার্ক, সুরক্ষা ব্যবস্থা, ফাংশন, এ্যাপ্লিকেশন, মেমোরি ইঞ্জিন, বিভিন্ন স্টোরেজ, ডাটাবেস, বিগ ডাটা ইত্যাদি। সময়ের পরিক্রমায় ক্লাউড কম্পিউটিং পদ্ধতি ভার্চুয়াল কম্পিউটার থেকে যেমন একাধিক ভার্চুয়াল যন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে, তেমনি শুরুর সময়ের তুলনায় বর্তমানে আরও বেশি সুবিধা ও নিরাপত্তা উপভোগ করতে পারছেন ব্যবহারকারীরা। আর এটিই ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের মূল বিপ্লব।

গুগল ড্রাইভের ব্যবহার ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের বাস্তব উদাহরণ। তথ্য সরবরাহ এবং সুরক্ষার জন্য অনলাইন ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল রিসোর্স যেমন– ডেটা, প্রোগ্রাম, স্টোরেজ, সার্ভার, নেটওয়ার্ক ও অন্যান্য ডিজিটাল সেবা চাহিবামাত্র ও চাহিদা অনুযায়ী ব্যবহার করার সুযোগ প্রদানে ভাড়া দেওয়া ইত্যাদি কারণে ক্লাউড কম্পিউটিং এখন খুবই জনপ্রিয়। গুগলের তথ্যমতে, ২০২০ সালে ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগ হবে প্রায় ২২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৮ সালে ছিল ১৬০ বিলিয়ন। এছাড়াও ২০২৪ সালের মধ্যে বেশিরভাগ উদ্যোক্তা এবং প্রতিষ্ঠান ক্লাউডের সঙ্গে পুরোপুরি যুক্ত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

২০২৫ সালে ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের ব্যবহার বর্তমানের চেয়েও পাঁচগুণ বেড়ে যাবে বলে ধারণা গুগলের। তথ্যের একাধিক স্তরের নিরাপত্তা, সহজলভ্য, দ্রুত ও কম খরচ ইত্যাদি বিবেচনায় ক্লাউড কম্পিউটিংকে আজ ডিজিটাল রূপান্তরের চাবিকাঠি বললেও ভুল হয় না। ব্যবহারকারীকে অফিসলেস, পেপারলেস এবং সর্বোপরি ডিভাইসলেস সুবিধার আওতায় এনে গোটা বিশ্বকে স্মার্ট নেটওয়ার্কের আওতায় আনাই ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। ব্যবসায়িক সুবিধা এবং কর্মসংস্থানের বিপুল সম্ভাবনার ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে ক্লাউড কম্পিউটিং। ধারণা করা হচ্ছে, ক্লাউড কম্পিউটিং সিস্টেম আগামী ১০ বা ১৫ বছরের মধ্যে এক অসীম যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করবে এবং মানুষ তখন রাউটার, ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক এসব নিয়ে আর কথাই বলবে না। এমনকি ছোট ছোট কোম্পানিগুলো তাদের কোম্পানির ওয়ার্কস্টেশনের জন্য আলাদাভাবে কোনো কম্পিউটার, রাইটার, টাওয়ার, সার্ভার এসব কেনার পরিবর্তে শুধু মাউস, মনিটর, কীবোর্ডকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য থিনা ক্লায়েন্ট প্রযুক্তি বেছে নেবে।

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার নেপথ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে ডিজিটাল সংযোগ স্মার্ট বাংলাদেশের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। কেননা ডিজিটাল সংযোগই হবে পরবর্তী উন্নয়নের মহাসড়ক। ডিজিটালাইজেশনে বাংলাদেশে বিপ্লব ঘটে গেছে। বাংলাদেশ এখন ডিজিটাল দেশ। কিন্তু ২০০৯ সালের আগে বাংলাদেশে এমনকি সরকারি কোনো সেবাই ডিজিটাল পদ্ধতিতে ছিল না। বর্তমানে ওয়েবসাইটে সরকারি সব দপ্তরের প্রাথমিক সব তথ্য ও সেবা মিলছে। সেই সঙ্গে সরকারি সব তথ্য যাচাই-বাছাই ও সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন পরিষেবা ও আবেদনের যাবতীয় কার্যক্রম অনলাইনে পরিচালিত হচ্ছে। ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে গেছে প্রত্যেক গ্রাহকের হাতের মুঠোয়। ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে অনেক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে। ফ্রিল্যান্সিং থেকে আসা অর্থ আমাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করছে। এসব কিছুই হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল।

ডিজিটাল বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ফলে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত ইন্টারনেট পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মতো উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের কর্মসংস্থানও নিশ্চিত করা গেছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অঙ্গীকার সফলভাবে বাস্তবায়নের পর বাংলাদেশ এখন নতুন কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি- এ চারটি মূল ভিত্তি করে ২০৪১ সাল নাগাদ গড়ে উঠবে স্মার্ট বাংলাদেশ। এই দেশ হবে সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিদীপ্ত, জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনী দেশ।
স্মার্ট বাংলাদেশের সমাজ হবে স্মার্ট সমাজ। স্মার্ট বাংলাদেশ নিশ্চিত

করবে বৈষম্যমুক্ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়ভিত্তিক এক সমাজব্যবস্থা। কাঙ্ক্ষিত সেই সমাজ হবে সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ সহনশীল সমাজ। এ সমাজ হবে নিরাপদ ও টেকসই। এ রকম স্মার্ট সমাজ গড়ার লক্ষ্য পূরণে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের বিকল্প নেই। স্মার্ট সমাজে অফিসের কাজ কাগজবিহীন হবে। লেনদেন হবে নগদবিহীন। এ লক্ষ্য অর্জনে আমরা স্মার্ট জেলা ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছি। দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়কেও ধাপে ধাপে কাগজবিহীন করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষও পর্যায়ক্রমে সব ধরনের আর্থিক লেনদেন ক্যাশলেস করে ফেলবে। একটি মানবিক, ন্যায় ও স্মার্ট সমাজ গঠনে স্মার্ট মানুষ অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে এমনভাবে ব্যবহার করবে যেন প্রযুক্তি তাকে ব্যবহার করতে না পারে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি যেন মানুষকে অতিরিক্ত সমস্যায় না ফেলে, স্মার্ট মানুষ সেই বিষয়টি বিবেচনায়

রাখবে। তারা প্রযুক্তির ব্যবহার করবে মানুষের কল্যাণে এগিয়ে আসার জন্য।

২০৪১ সালের মধ্যে মেধানির্ভর অর্থনীতির দেশ হবে বাংলাদেশ। ওই সময় নাগরিকদের মাথাপিছু আয় হবে বর্তমান মূল্যে ১২ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা, যেখানে দারিদ্র্যের হার হবে সুদূর অতীতের ঘটনা।

কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ গুরুত্বপূর্ণ সব খাতে অগ্রসর প্রযুক্তিনির্ভর সমাধানের ব্যবহার করে আমাদের সরকার ২০৪১ সাল নাগাদ জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি খাতের অবদান কমপক্ষে ২০ শতাংশ নিশ্চিত করতে চায়।

স্মার্ট ইকোনমিতে গড়ে উঠবে উদ্যোক্তামুখী, গবেষণা ও উদ্ভাবননির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এ অর্থনীতি হবে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি। আর্থিক লেনদেন হবে নগদবিহীন। পণ্যের পুনঃব্যবহার করে বৃত্তাকার অর্থনীতি গড়ে তোলা হবে। ফলে শূন্য বর্জ্য উৎপাদন হবে। আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স (এআই), রোবটিক্স, ব্লকচেইন, ড্রোনসহ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের অগ্রসর প্রযুক্তিনির্ভর গবেষণা ও উদ্ভাবনী সমাধান হবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি।

স্মার্ট ইকোনমির মেরুদণ্ড হবে আমাদের স্মার্ট উদ্যোক্তারা। চাকরি খোঁজার মানসিকতা পরিবর্তন করে, চাকরি দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করতে পারলেই ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট ইকোনমি গড়ে উঠবে। আমরা জাতিগতভাবে সাহসী, উদ্ভাবনী, সৃজনশীল, পরিশ্রমী, মেধাবী এবং ঝুঁকি নিতে ভয় করি না। স্মার্ট সরকার প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে আইনের শাসন, দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং জনগণের অংশগ্রহণ গণতান্ত্রিক উপায়ে নিশ্চিত করে স্মার্ট সুশাসন গড়ে তুলবে। স্মার্ট সরকার হবে নাগরিককেন্দ্রিক, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক। কাগজবিহীন, উপাত্তনির্ভর, আন্তঃসংযুক্ত, আন্তঃচালিত, সমন্বিত ও স্বয়ংক্রিয়। যোগাযোগে কাগজের ব্যবহার হবে না। সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হবে উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে। অগ্রসর প্রযুক্তির ব্যবহার করে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহন, জ্বালানি, বিদ্যুৎ, বিচারব্যবস্থার মতো জরুরি খাতগুলো পরিচালিত হবে অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট সরকার ডিজিটাল নথির উন্নত সংস্করণ স্মার্ট নথি বাস্তবায়ন করবে। এ ব্যবস্থায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিগ ডাটা অ্যানালাইসিস, ব্লক চেইনসহ অন্যান্য ফ্রন্টিয়ার প্রযুক্তি ডিজিটাল নথির সঙ্গে যুক্ত করা হবে। সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা হবে।

স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মধ্যেই বিজ্ঞানে কোনো না কোনো বাংলাদেশি বিজ্ঞানী সাফল্যেও শিখরে উঠবেন শুধু যে বিদেশেই মেধাবী বাংলাদেশিরা গবেষণায় নেতৃত্বে দিয়ে সুনাম কুড়াচ্ছেন তা নয়, এ দেশে থেকেও বিশ্বমানের কিছু গবেষণা পরিচালনা করছেন অনেকে। জনস্বাস্থ্য নিয়ে কাজের জন্য বাংলাদেশি গবেষকরা তৃতীয় বিশ্বের গবেষকদের জন্য রোল মডেল। যেমন আইসিডিডিআরবির জীববিজ্ঞানী ড. ফিরদৌসী কাদরীর কথা বলা যায়। তিনি ২০২১ সালে এশিয়া মহাদেশের নোবেল-খ্যাত র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার পেয়েছেন। কিংবা স্থপতি মেরিনা তাবাসসুমের কথা বলতে পারি, তিনি স্থাপত্যবিদ্যার মহাপ্রসিদ্ধ আগা খান পুরস্কার পেয়েছেন। কিংবা বলা যায় অণুজীববিজ্ঞানী ড. সেঁজুতি সাহার কথা, যার নেতৃত্বে বাংলাদেশে প্রথম করোনা ভাইরাসের জিন নকশা উন্মোচিত হয়।

আমরা নিশ্চয়ই আশা রাখতে পারি, বাংলাদেশের উত্তরোত্তর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে বিজ্ঞানের নানান ক্ষেত্রের গবেষকরা তাদেও মৌলিক গবেষণা ও আবিষ্কারের মাধ্যমে দেশের তথা পুরো বিশ্বের নানান সমস্যা নিরসনে ভূমিকা রাখতে পারবেন। স্বীকৃতিস্বরূপ নোবেলের মতো পুরস্কারে ভূষিত হবেন তারা, এ প্রত্যাশা আমরা করতে পারি।

আমাদেও দেশের ছেলেমেয়েরা মূলত দু'টি কারণে বিদেশে চলে যাচ্ছে- এক. উচ্চশিক্ষা, এবং দুই. চাকরি। আমরা যদি দেশেই বৈশ্বিক মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা ও প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরি করে দিতে পারি, তাহলে এ প্রবণতা অনেকখানিই কমবে। এর পাশাপাশি আমাদের দেখতে হবে, আমরা প্রশিক্ষিত এই তরুণদের জন্য দেশেই কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি করতে পারছি কিনা। উচ্চশিক্ষিত, প্রশিক্ষিত, দক্ষ ও মেধাবী তরুণরা বিদেশে কাজের যে অবাধ সম্ভাবনা দেখতে পায় এবং যে জীবনমান তারা সেখানে পায়, আমরা তা দেশের ভেতরেই সৃষ্টি করতে চাই। স্মার্ট বাংলাদেশে তরুণরা তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবে। সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশের চাকরির বাজারে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে, সেখানে এমন দক্ষ, যোগ্য ও মেধাবী তরুণদের সঠিক মূল্যায়ন হবে। খুব শিগগিরই বাংলাদেশ উন্নত দেশের তালিকায় নাম লেখাবে; এ জন্য যা যা করা দরকার, আমরা তার প্রস্তুতি সরকার গ্রহণ করছে। দেশের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি খুব শিগগিরই আরও উন্নত হবে। তখন এ তরুণদের আমরা ধরে রাখতে পারব। আমি নিশ্চিত, আমাদের দেশপ্রেমিক তরুণরাও নিশ্চয়ই দেশের এ উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেবে।

হীরেন পণ্ডিত: প্রাবন্ধিক ও গবেষক
ফিডব্যাক: *hiren.bnnrc@gmail.com*
ছবি: ইন্টারনেট